ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2145-2152
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.476

স্তনদায়িনী: একটি নিবিড় পাঠ ও প্রতিক্রিয়া

ড. অপর্ণা দেব, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সন্তোষ কুমার রায় মহাবিদ্যালয়, হাইলাকান্দি, অসম, ভারত*

Received: 22.05.2026; Accepted: 27.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In her renowned short story 'Stanadayini' the acclaimed writer Mahasweta Devi vividly illuminates the position of women within a patriarchal social order through the life of Yashoda. Social and cultural norms often make women's exploitation appear natural by presenting caregiving and maternal labour as duties rather than valuable work. This paper examines Mahasweta Devi's Stanadayini (Breast-Giver) from a feminist perspective to explore how women's labour and bodies are exploited within patriarchal society. Using close textual analysis, the study investigates the experiences of Jashoda, whose maternal labour sustains both her family and the Haldar household. The analysis reveals that Jashoda's motherhood and bodily labour are celebrated as noble sacrifices while being exploited for the benefit of others. She accepts her suffering as a social responsibility, which conceals the unequal power structures that depend on her labour. The paper highlights Mahasweta Devi's critique of patriarchal values that romanticize women's sacrifice and normalize their exploitation.

Keywords: Feminism, Motherhood, Exploitation, Patriarchy, Gender Roles, Mahasweta Devi

সুপ্রতিষ্ঠিত কথাকার মহাশ্বেতা দেবী বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বিশ্বভারতী থেকে ইংরেজিতে স্নাতক হন। পরে ইংরেজি সাহিত্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে এম.এ. পাস করেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র ধারার লেখিকা। জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁর সাহিত্য তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। তিনি যা দেখেছেন এবং যা আহরণ করেছেন তারই আলোকে গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন।

লেখা ছিল তার জীবিকা, তেমনি লেখা তাঁর কাছে ছিল মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবীর বক্তব্যেও তাই স্পষ্ট ছিল,

> "লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসেবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না।"[১]

সামাজিক চেতনা এবং যথার্থ শৈল্পিক বোধ তাঁকে অন্য লেখকের থেকে স্বাতন্ত্র্যতা এনে দিয়েছে। সাহিত্য কর্মটি যে লেখিকার প্রবল নিষ্ঠার নিদর্শন তা তাঁর সাহিত্য আলোচনা করলেই বোঝা যায়। তাই তো তিনি মহাশ্বেতা, সবার থেকে স্বতন্ত্র।

বাংলা ছোটগল্পে এক ব্যতিক্রমী স্রষ্টা তিনি। আদিবাসী, নিপীড়িত, নির্যাতিতদের কল্যাণব্রত প্রাণ, শ্রদ্ধেয়া সক্রিয় সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবী। বর্গ, বর্ণ ও লিঙ্গগতভাবে যারা ক্রমশ অপমানের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, মহাশ্বেতা দেবী সেই সর্বহারাদের সমস্যার কথাই শুধু বলেন না তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করেন। তাদের সকল ক্রিয়া কাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আবার কখনো বিপ্লবের বাণীকে নিরবে নিভৃতে কাঁদতে না দিয়ে শাসনের সিংহাসন দলের টান দেন। কারণ তিনি নিজেই অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন নিষ্ফল পাথরে মাথাকুটে মরলে আমাদের পাশের পরিজনদের পরিত্রাণ অসম্ভব। দক্ষ কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী পথ চলতে চলতে বারবার নিজেকে বদলেছেন, গড়েছেন, ভেঙেছেন আবার নতুন করে গড়েছেন। নিজের মত তাঁর শিল্পকেও নিজের আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

যে পরিবারে মহাশ্বেতা জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরিবারের সদস্যরা বাঁধা পথে হাঁটার পথিক ছিলেন না, নিজেদের পথ নিজেরাই নির্মাণ করে প্রায় সকলেই কিছু কিছু স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন। মহাশ্বেতার পিতা মনীশ ঘটক ও মা ধরিত্রী দেবী ছিলেন স্বাধীনচেতা সাহিত্য রস পিপাসু ব্যক্তিত্ব। মহাশ্বেতা দেবীর মানস গঠনে তাঁর মায়ের অবদান ছিল অনেক খানি। মহাশ্বেতা দেবীর কাকা ছিলেন বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। পারিবারিক ঐতিহ্যই মহাশ্বেতার লড়াকু মনের ভিতটা তৈরি করে দিয়েছিল। আশাপূর্ণা দেবী এক জায়গায় বলেছেন আরামকে হারাম ভেবেই তিনি সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন, তার ফলেই তাঁর যা কিছু সাফল্য, মহাশ্বেতা দেবীও তার ব্যতিক্রম নন। মহাশ্বেতা দেবী বঞ্চিত মানুষের,আদিবাসী সমাজের, ক্ষেতমজুর, রিক্সাচালক যে কোনো নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষ যাদের সমস্যা দেখেছেন সমাধানের জন্য তিনি তাদের কাছে ছুটে গেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল নিপীড়িত অসহায় মানুষকে সহায়তা করা। কোন চোখ রাঙানি, সমালোচনা, রাজনৈতিক মতাদর্শের অচলায়তন, কোন কিছুই তাঁর উদ্দেশ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। মহাশ্বেতা দেবীর এই আপোসহীন সংগ্রামী সত্তা গঠনে তাঁর পারিবারিক পরিবেশটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। লেখিকার নারী ব্যক্তিত্ব গঠনে তার পৃতিকুল ও মাতৃকুল উভয় তরফের প্রচুর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। লেখিকা নিজেই এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "মায়ের দিক এবং বাবার দিক— দুই দিক থেকে আমি পেয়েছি বিশেষ পারিবারিক পট, ভিন্নতর পারিবারিক পরিবেশ। সেই পরিবেশে নারীর বড় ভূমিকা ছিল। আমাদের ঠাকুমা ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী নারী। বই পড়তেন খুব। তার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা যেটা আমার মনে হয়েছে সেটা হল বৈভবে বা অভাবে— সমস্ত অবস্থাতেই তিনি থাকতে পারতেন অবিচল।..... আমার সাহিত্য ও স্বদেশ চেতনার ঋণ আমার মাতৃকুলের নারীদের কাছে। দিদিমা ছিলেন প্রচুর পড়াশোনা করা স্বদেশ চেতনা সম্পন্ন মহিলা। দাদামশাই ঢাকাতে ওকালতি করতেন। পয়সা ছিল না কিন্তু দিদিমাকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেওয়ার মতো মনের প্রসার ছিল। দিদিমার যোগাযোগ ছিল ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের সঙ্গে। তাঁকে সাহায্য

> করতেন দিদিমা। দিদিমা তার মেয়েদের স্কুলে পাঠাননি কিন্তু নিজে ইতিহাস - ভূগোলের পাঠ্যপুস্তক তৈরি করে তাদের পড়িয়েছেন।"[২]

মহাশ্বেতা দেবী অন্ত্যজ আদিবাসী মানুষদের ভাষা-সংস্কৃতির, তাদের রিক্ত, বঞ্চিত শোষিত জীবনের সমব্যথী রূপকার। একদিকে ধনী ও শিক্ষিত সমাজের প্রতি যেমন ছিল তার গভীর অবিশ্বাস তেমনি অন্যদিকে অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামবাসীদের সততা, নিষ্ঠা, সারল্য ও ধৈর্যের প্রতি ছিল গভীর আস্থা ও সম্মান। লেখিকার কথা সাহিত্যে দেখা যায় ধনী আর নির্ধন, শোষণকারী ও শোষিত শ্রেণীর বিশ্বাসের প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব।

নারী চরিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার। তাঁর নারীরা সমাজ নির্দিষ্ট গভীর সীমায় আবদ্ধ নয়। তারা কখনো মা, কখনো বধু, কখনো বা প্রবল আত্মদৃপ্ত মহীয়সী নারী। আমাদের আলোচ্য 'স্তনদায়িনী' গল্পের যশোদা নারী জাতির এমনই একটি উদাহরণ। বলিষ্ঠ লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর অধিকাংশ গল্পে নিম্ন বর্ণের প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনার কথা বললেও 'স্তনদায়িনী' গল্পটি একটু ব্যতিক্রমী গল্প। 'স্তনদায়িনী' গল্পটিতে উচ্চবর্ণের এক অবহেলিত নারীর যাপিত জীবনের যন্ত্রণার কথা উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পের নায়িকা যশোদা উচ্চ বর্ণের গরিব ঘরের বউ। অবহেলিত বঞ্চিত এই মানুষগুলির কথা বলতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী প্রথমে মানুষের প্রাথমিক ও প্রয়োজনের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেটি হলো খিদে। খিদের জ্বালায় এরা বারবার জর্জরিত হয়েছে। খিদের জ্বালায় জর্জরিত ও খাওয়ার জন্য একান্ত আগ্রহ মহাশ্বেতার অনেক গল্পের পটভূমি তৈরি করেছে। 'জন্মতিথি', 'বান', 'ব্রাহ্মণ', 'সাঁঝ সকালের মা' প্রভৃতি এই ধরনেরই গল্প। হতভাগ্য, অপমানিত মানুষগুলির বঞ্চনার কথা বলতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী স্বভাবতই ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন। এই ইতিহাস আদিম জনগোষ্ঠীর বাঁচার লড়াইয়ের ইতিহাস। সাহিত্যের বিচার যথার্থ কী হওয়া উচিত তা বলতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় লিখেছিলেন,

> "সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদন্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোন লেখককেই মূল্যায়ন করা যায় না। পুরাকথাকে পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকাবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য।"[৩]

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গল্প রচনা করতে গিয়ে একুশ শতকেও দেশের লক্ষ লক্ষ উপজাতি শ্রেণীর মানুষের অন্ন, জল, মাটির চাহিদা যে পূরণ হয়নি তারই চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। তাই মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গীয় সমাজের বিশেষ দলিল। মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্যে যেসব মানুষদের কথা বলেছেন, সাহিত্যে তাদের কথা বলারও প্রয়োজন রয়েছে, সেই কথাটি স্বীকার করে নিয়েই তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে হবে। বঞ্চিত মানুষদের একজন হয়েই প্রান্তিক মানুষদের বঞ্চনার স্বরূপ তিনি উদঘাটন করেছেন। আলাদা করে নারীর কথা বলতে হয়নি মহাশ্বেতাকে, পিতৃতন্ত্রের কাছে নিপীড়িত বর্গের গোটা সমাজটাই যেখানে প্রান্তিক সেখানে তাদের কথা বলার মধ্য দিয়ে অবলীলায় নারীর উপর অনাচার অত্যাচারের কথা উঠে আসছে ক্রমান্বয়ে। উন্নয়নের অজুহাতে যাদেরকে বাস্তুভিটা থেকে বার বার উৎখ্যাত করা হয়েছে, অরণ্যের অধিকার যাদের কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সরলতার সুযোগ নিয়ে যাদেরকে কেবল বঞ্চনা করা হয়েছে- সেইসব মানুষদের কথাই মহাশ্বেতার কাহিনী নির্মাণের প্রধান উপকরণ।

'স্তনদায়িনী' গল্পে লেখিকা বহু সন্তানের 'দুধ মা' হয়ে আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আলোয় গল্পটিতে জননী চরিত্রকে বৈচিত্রময়ী করে তুলেছেন। নারী কেবল মা নয়, যেন আরও কিছু— বহমান ছল ছল জীবনের স্রোতস্বিনী নদী। যে নদী বাঁক নিয়ে আপন স্বাতন্ত্র্যে হয়ে উঠতে পারে আত্মত্যাগী এক পবিত্র জননী। একথা

বলার কারণ যশোদা নিজের জীবনকে তিল তিল করে খুইয়ে পবিত্র সাগরে অবগাহনের মধ্য দিয়ে যেভাবে তার সংসারকে প্রতিপালন করেছে— তা তো এক পবিত্র জননীর প্রতিমূর্তি। গল্পটির আসল তাৎপর্য বা সার্থকতা এখানেই। যদিও সেই করুণাময়ী জননীর আড়ালে লুকিয়ে আছে এক দুঃখী নারীর হৃদয় বেদনা। নিজের আত্মবিসর্জন এর মধ্য দিয়ে পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখা এবং নিজের সব ভোগ বিলাস থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সরিয়ে রাখার মধ্যে যশোদা অর্জন করেছে দেবীত্ব ও শাশ্বত শক্তিরূপী মাতৃত্ব। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী যশোদাকে মানবী থেকে দেবী হওয়ার কথা বললেও এর অভ্যন্তরে এক চিরদুখিনী রক্তমাংসের নারীকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব ও মায়ের অপত্য স্নেহ কর্তব্যবোধ থেকে যশোদা যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল গল্পের পরিণতিতে সে যে এক রক্তমাংসের নারী তা লেখিকা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

গল্পের নায়িকা যশোদা উচ্চবর্ণের গরিব ঘরের বউ। তার স্বামী কাঙালি চরণ ময়রার দোকানের কারিগর। উপার্জনের সাথে সাথে মাঝে মাঝে সিঙ্গারা, জিলাপি ইত্যাদি চুরি করে সংসার চালাতে কাঙ্গালির তেমন বেগ পেতে হতো না। বর্ণের কৌলিন্যে মাঝে মাঝে হালদার কর্তার মত সম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা তার পায়ের ধুলা নেন। তাদের বাড়িতে সন্তানাদি হলে যশোদাও মাঝে মাঝে কাপড়, সিন্দুর ইত্যাদি উপহার পায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় কাঙ্গালির সুখী সংসার। বউয়ের মনের কথা বুঝুক না বুঝুক শরীরের কথা খুব ভালো করে বুঝে কাঙ্গলি চরণ। যশোদার কচি শরীর সুবর্তুল স্তন কাঙ্গালির ভাবনার জগতে সব সময় ঘুরপাক খেতে থাকে। দুপুরবেলা বাড়িতে ভাত খেয়ে বিশ্রামের সময় যশোদার প্রতি তার বাৎসল্য ভাব জাগে এবং যশোদার স্ফীত স্তন নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে ঘুমিয়ে পড়ে। কাজের ফাঁক-ফোঁকরে নাড়াচাড়া করে কাঙালির আশ মেটে না, নারীর শরীরের মাংসপিন্ডের শেষ অবশেষটুকু না নিংড়ালে পুরুষের স্বস্তি হয় না। এজন্যই দুপুর নাগাদ বাড়ি ফিরে কাঙ্গালিচরণ সেই স্বর্গ সুখ থেকে সহজে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। কচি মেয়ে বিয়ে করে তাকে কম খাটিয়ে প্রচুর খাওয়ালে আখেরে দুপুরে সুখ মেলে একথা চিন্তা করে তার নিজেকে দূরদর্শী পুরুষ বাচ্চা বলে মনে হচ্ছিল। গল্পের ভিতর লুকিয়ে থাকে এমন এক ইঙ্গিত যা একেবারেই পশু তুল্য। বলির পাঠাকে খাইয়ে পড়িয়ে নাদুস নুদুস বানিয়ে খাওয়ায় যেমন তৃপ্তি আসে, কাঙ্গালির ভাবনায়ও ঠিক সেরূপ তৃপ্তি কাজ করছিল। যদিও কাঙ্গালির ভাগ্যে এ সুখ বেশিদিন সয় নি। হালদার বাড়ির কোন এক দুরন্ত ছেলের মোটরগড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে কাঙ্গালি চরণের পা অকেজো হয়ে যায়। হালদার কর্তার সহানুভূতিতে কাঙ্গালি তখন বাঁচার উপায় পায়। হালদার কর্তা তখন কাঙ্গালী কে বলেছিলেন,

'হ কাঙ্গালি! তোমার লিগ্যা জায়গা দেইখ্যা থুইছি। আমার বারিন্দায় ছাউনি দিয়া এট্টা দোকান কইরা দিমু। সামনে সিংহবাহিনী। যাত্রী আসে, যাত্রী যায়। তুমি মুড়ি-মুড়কি, চিড়া, বাতাসার দোকান দাও। অহন বাড়িতে বিয়া লাগছে। আমার সপ্তম পুত্র, সেই আবাইগার বিয়া। যদ্দিন না দোকান অয়, তদ্দিন সিধা যাইবে।' কাঙালি চরণের প্রতি হালদার কর্তার এরূপ দয়া দেখে সকলে বিস্মিত হয়েছিল। মনিবের এরূপ পরিবর্তনের পিছনে তারা ঈশ্বরের কোন গোপন ইচ্ছা আর ছায়া খুঁজে পায়। গ্রামে দেবী সিংহবাহিনীর অধিষ্ঠান, কাঙালিচরণের এই সৌভাগ্যের পিছনে দেবীর অদৃশ্য করুণা সকলেই অনুভব করে। মন্দিরের পুরোহিত নবীন পান্ডাও দেবীর করুণায় আপ্লুত হয়। তবে হালদার কর্তার এহেন করুণার নেপথ্যে যশোদার স্তন, গুরুনিতম্বা, শরীরের ভূমিকাটিও তার পাপী থেকে মন উড়িয়ে দিতে পারেনা নবীন। যশোদাকে মা যশোদা সাজিয়ে মন্দিরে বসাবার বাসনাও জাগে তার মনে। কিন্তু কাঙ্গালিচরণ তো পুরুষ, তাই সুদেহের অধিকারী নারীকে ঘিরে নবীন পান্ডার মনের সুপ্ত ইচ্ছাটাকে বুঝে নিতে কাঙালির বিলম্ব হয় না। যশোদার উপর দেবীত্বের মহিমা চাপিয়ে তাকে করায়ত্ত্ব করার ইচ্ছা নবীনের মধ্যে যে সক্রিয় ছিল, কাঙ্গালীচরণ তা বুঝতে

পারে। যশোদার শরীর নিয়ে কাঙালির যে ভাবনা, সেই শরীর দিয়েই কাঙ্গালির ভাবনাকে দূর করে দিয়েছিল সেদিন যশোদা। কাঙ্গালির সন্দেহ দূর করার জন্য সে তার সন্দেহী মাথাটাকে সুউন্নত 'দুই গোলার্ধের' মাঝখানে চেপে ধরে আশ্বস্ত করেছিল, 'রোজ বাবুদের দুটো ঝি এখেনে শুত আমাকে পাহারা দিতে। নবনেকে আমি আমল দিই? আমি না তোমার সতী স্ত্রী?' নবীন পান্ডার প্রতি ভরসা করতে পারেনি কাঙালি, তাই অর্থাগমের সহজ পরামর্শটিও সে গ্রহণ করেনি। অবশ্যই নবীন পান্ডা যাই ভাবুক, যশোদার মধ্যে মাতৃত্ব আরোপের একটি ব্যাপার হালদার বাড়ির মানুষের দ্বারাও প্রচারিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে মায়ের করুনার অংশীদার হয়ে যশোদা ধাই হয়ে সন্তান পালন করবে, এ ধরনের একটা স্বপ্ন মঙ্গলের কথা অনেকের গোচরে আসে। ঘটনা ক্রমে হঠাৎ করে হালদার কর্তা হার্ট ফেল করে মারা যান।

হালদার কর্তা কাঙালিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কর্তার মৃত্যুর পর হালদার গিন্নি সেই প্রতিশ্রুতির দায় নিজের মাথায় নিতে রাজি হননি। বাধ্য হয়ে যশোদাকে মাতৃত্বের দায়ভার নেবাতে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়। হালদার গিন্নি কে অনেক বলে— কয়ে তাঁর নিরামিষ হেঁসেলের রান্নার কাজ চেয়ে নেয় যশোদা। হালদার বাড়ি যাওয়ার সময় যশোদা সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল সবথেকে ছোট সন্তান রাধারানীকে। গিন্নি তখন তার একটি নাতিকে বোতল দিয়ে দুধ খাওয়াবার চেষ্টায় জেরবার হচ্ছিলেন। বাচ্চাটার মায়ের অসুখের জন্য সে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত অথচ 'এমুন পোলা যে বুতল মুখে ধরে না।' তিনি যশোদাকে অনুরোধ করেন, 'মা আমার ভগবান হইয়া আসছ! এ্যারে দুধ দাও মা, পা ধরি।' পা অবশ্যই ধরতে হয়নি, যশোদা রাত নটা অবধি হালদার কর্তার বাড়িতে থেকে গিন্নির নাতিকে দফায় দফায় দুধ দিল। ঘটনা পরিক্রমায় দেখা যায় অর্থনৈতিক চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিনে তার স্তন্য রস সুধাই হয়ে উঠল পরিবার প্রতি পালনের একমাত্র অবলম্বন। এই পরিস্থিতিতে যশোদা হয়ে উঠল পেশাদার মা আর তার সুবর্তল স্তনযুগলই হয়ে উঠল মহার্ঘ সম্পদ। শরীর তত্ত্বের কোন জটিল প্রক্রিয়ায় তার স্তনে দুধ আসে সেটা যশোদার নিজের কাছেও একটা বিস্ময়। যশোদার পেশাদার মা হওয়ার পিছনে অনেকগুলো অঙ্ক কাজ করে। এক, হালদার বাড়ির বউদের স্তনের সুডৌলতা রক্ষে পায়, বুকের দুধ খাওয়াতে হলে সে স্তন কবে জিরজিরিয়ে যাবে, স্বামীরা বারমুখো হবে, নয়তো মুখ বুঁজে সইতে হবে বাড়ির ঝি-দের উপর স্বামীদের উৎপাত। তাই হালদার বাড়িতে যশোদার আদর যত্ন বেড়ে গেল। আর যশোদা হালদার বাড়িতে ভগবতী হয়ে উঠল। এই ভক্তিভাব এমন পর্যায়ে গিয়ে চড়ল যে বিয়ে সাধ অন্নপ্রাশন পৈতেতে যশোদাকে ডেকে ডেকে এয়োর সম্মান জোগানো শুরু হল। হালদার গিন্নি যখন যশোদাকে বলেন, 'কামধেনু কইরা তোমায় পাঠাইছিল বিধাতা', যশোদাও সেই কথায় সায় দিয়ে বলে, 'সে আর বলতে মা! গোপাল ছেড়ে দিল, বয়স হলো তিন বছর। এটা তখনো পেটে আসেনি।তাতেও দুধ যেন বান ডাকত। কোত্থেকে আসে মা? খাওয়া নেই, মাখা নেই!'

যশোদার সুবর্তুল স্তন এবং অফুরান দুগ্ধ ধারা কাঙালিচরণের কাছে শুধু মহার্ঘ নয়, যশোদা নিজেও স্তন দুটিকে মহার্ঘ মনে করে। রাতে কাঙালিচরণ খুনসুটি করতে এলে সে বলল, 'দেখ! এখন এর জোরে সংসার টানব। বুঝে-শুনে ব্যবহার করবে।' এককালে যশোদার সুবর্তুল স্তন ছিল কাঙ্গালিচরণের আরাম-আয়েশের উপকরণ, নবীন পান্ডার কামনার ধন, আজ তার স্তনজোড়া অভাবী মুখে অন্ন জোগাবার মাধ্যম এবং হালদার বাড়ির অনেক মুশকিল আসানের সমাধানের সূত্র। শেষ পর্যন্ত যশোদার নিয়তি তাকে পেশাদার মার ভুমিকায় অবতীর্ণ করে। কাঙ্গালীচরণ যশোদকে বলে, 'পেটে সন্তান থাকলে তবে তো তোর বুকে দুধ আসবে। এখন সে কথা ভেবেই তোকে কষ্ট করতে হবে। তুই সতীলক্ষ্মী। নিজেও পোয়াতি হবি, পেটে ছেলে ধরবি, বুকে পালন করবি, ও জেনেই মা তোকে ধাইবেশে দেখা দিইছিল।' এই উক্তিতে এটাই স্পষ্ট যে নারী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সব উপকরণে পুরুষতন্ত্রের হাটে বিকোবার পণ্য বিশেষ। নারীকে সতীত্বের ভাব-শৃঙ্খলে বন্দি রেখে

পুরুষ তাকে বহুগামীতার পথ থেকে আগলে রাখারও চেষ্টা করে। সতীত্বের সংস্কারটাকে যশোদার মনে অবিচল রাখার জন্য কাঙ্গালিচরণ যে মুখ্য উপায় অবলম্বন করেছে সেটা হল নারীর উপর দেবত্বের আরোপ। অর্থাৎ দুটি স্তনের মাহাত্ম্যে ঢাকা পড়ল স্তনদায়িনীর বাস্তব সত্তা। মায়ের অপার মহিমার সাথে যশোদাকে মিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গালীচরণ তার পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পরিপুষ্টিসাধন করেছে। নারীকে থাকতে হবে এক পতি নির্ভর, কিন্তু পুরুষের বহু পত্নীত্বে আপত্তি নেই, এই নিষ্ঠুর সামাজিক সত্যটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

সুতরাং বউ থাকা সত্ত্বেও কাঙ্গালি যখন গোলাপীর দিকে আকৃষ্ট হয়, নবীন ও গোলাপির ভাই-রা তার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পায় না। গ্রামের নকুলেশ্বর মন্দিরে সেবক সেজে নবীন পান্ডার বোনঝির সঙ্গে কাঙ্গালি নূতন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। গোলাপি মন্দিরে এসে সব সময় ধন্না দিতে শুরু করে। আর কাঙ্গালি বুঝে নেয় ও হচ্ছে ঠাকুরের ভৈরব আর গোলাপি ওর ভৈরবী। খাওয়া পরার ঝঞ্জাট সামলাচ্ছে যশোদা, তাই অনায়াসেই সে অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। পুরুষের হাতে মেয়েরা ব্যবহারের সামগ্রী মাত্র, এর জন্য একজনের ব্যবহার ফুরিয়ে গেলে অন্য জনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেক সন্তান প্রসব করে যশোদার শরীর মন আজ ক্লান্ত, ধ্বস্ত। একের পর এক সন্তান পেটে ধরে নিজেকে নিঃশেষ করেছে যশোদা। অন্যদিকে যশোদার আনা খাদ্যে উদরপূর্তি করে কাঙলি তাকে আজ বাবুর বাড়ির পথ দেখায়। 'ওর কথা আমায় বল না। ভাতার চেনে না,বাবুবাড়ি চেনে। বাবু বাড়ি ওর ইস্টি দেবতা,সেথা যাক গা।' এটাই বোধহয় যশোদার মত নারীর যোগ্য পাওনা, সংসারের জন্য সারা জীবন পাত করলেও সংসার তার শরীরের মর্যাদা দেয় না।

যে স্তনযুগলের জন্য যশোদার এত সৌভাগ্য ছিল সেইখানে অবশেষে কর্কট রোগ বাসা বাঁধল। যশোদার স্তন-যুগল এক কালে কাঙালির আদরের ধন ছিল, বাবুদের স্বার্থ জড়িত থাকায় গিন্নিমাও এর প্রতি যত্নশীল ছিলেন, সেই স্তন অকেজো হয়ে যায়। যশোদাকে আজ আর কারো প্রয়োজন নেই। অবহেলায় ও অচিকিৎসায় সকলের অনাদরে স্তনদায়িনী যশোদা মারা যায়। সংসার এতই নিষ্ঠুর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সে কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। দাতব্য হাসপাতালে যশোদা যখন মারা যায়, শবদাহন তো দূরের কথা, শেষবারের মতো তাকে কেউ দেখতে আসে নি। ডোমেরা তার শব দাহ করে।একসময় যখন সবার প্রয়োজন ছিল তাকে, তখন তারমধ্যে দেবীত্বের রূপ দেখেছিল সবাই। কিন্তু আজ যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বেড়ে পড়ে থাকলো, তখন মানুষ রূপেও সামান্য সম্মান দেওয়া হলো না তাকে। তাইতো গল্পকার বলেছেন, 'যশোদা ইশ্বর-স্বরূপিণী, সে যা ভাবে, অন্যেরা ঠিক তাই করে, তাই করল। যশোদার মৃত্যুও ঈশ্বরের মৃত্যু।' এ সংসারে মানুষ ইশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়। স্তন মাহাত্ম্যে প্রায় ঈশ্বরী হয়ে ওঠা যশোদার মৃত্যুকে মহাশ্বেতা তুলনা করেছে, ঈশ্বরের মৃত্যুর সঙ্গে। যশোদা নিজে ঈশ্বর সাজেনি, তাকে ঈশ্বর বানিয়েছে মানুষ। সেই মানুষ, বলা ভালো পুরুষ তান্ত্রিক সুবিধাভোগী মানুষ যারা তার ভিতর থেকে ঈশ্বর কণা লুণ্ঠন করে তাকে ঠেলে দিয়েছে অবহেলায়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে চিরবঞ্চিতা নারীকে চিরদিনই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সব বাধা-বিপদকে ডিঙিয়ে নিজের জীবনকে তিল তিল করে খুইয়ে দিয়ে পবিত্র সাগরে অবগাহন করতে হয়। সমাজ নারীকে ততদিনই ব্যবহার করে যতদিন তার প্রয়োজন থাকে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কোথাও তার একটুও জায়গা নেই, যশোদার জায়গা হয় না তাই পুরাতন মনিব বাড়িতে। সমালোচক 'স্তনদায়িনী' গল্পের যশোদা সম্পর্কে সম্পর্কে বলেছেন,

> "স্তনদায়িনী নারী কিংবা মা হওয়ায় জ্বালা যন্ত্রণার ছবি। একটা স্তরে এই মেয়েরা প্রায় একটাই মেয়ে হয়ে ওঠে, গল্পগুলো যেন সেই বাস্তব অথচ প্রতীকী নারীর ক্রমাবনতি ও অবমাননার শব্দরূপ।"[৪]

মহাশ্বেতা দেবী অনুভূতির আলোয় প্রকৃত সত্যই তুলে ধরেছেন যশোদা জীবন দিয়ে। দেহ মনের পবিত্রতা রক্ষা করে, একমাত্র জননীসত্তা দিয়ে অম্লানবদনে আত্মবিসর্জনের মধ্যদিয়ে যশোদা সংসার প্রতিপালন করেছিল। এই আত্মবিসর্জনে ভোগ লালসার বিন্দু মাত্র স্থান ছিল না।

নারীর সেবা নিতে পুরুষতন্ত্রের আপত্তি নেই, সেই সেবা যাতে ষোলআনা আদায় করা যায়, তার জন্য নারীকে প্রয়োজনের নানা উপকরণ যোগান দিয়ে সে ভরিয়ে রাখে। যশোদার বুকের দুধের যখন প্রয়োজন ছিল তখন হালদার বাড়িতে তার যত্নের ত্রুটি ছিল না। হালদার গিন্নিও ভাবতেন, 'গরু খাবে যত দুধ দেবে তত।' যশোদা অপরের সন্তানকে অকাতরে দুগ্ধ দান করেছে গাভীর মত।অন্যদিকে সিধা, নৈবদ্যে যতদিন ঘর ভরাতে পেরেছে ততদিন সংসারে তার আদর ছিল, কদর ছিল। হালদার বাড়ির গিন্নিমাও অধিক কাজ করে যাতে তার শরীর নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখতেন। কাঙালি কে ডেকে বলতেন, 'হ্যাঁ বামুন ছেলে? দোকানে ত তাড়ু নাড়তা, ঘরে পাকসাকের ভারটা নিয়া অরে আরাম দেও। নিজের দুটো, এখানে তিনটা, পাঁচটা কে দুধ দিয়া ঘরে গিয়া পাক সাক করতে পারে?' সংসারে দেবার ক্ষমতা থাকলে তাকেও যে কিছু শরীরগত আরাম দিতে হয় এটা অশিক্ষিত দারোয়ানরাও জানে। এজন্য তারা কাঙ্গলিচরণকে খৈনি দিতে দিতে বলেছিল— 'মা জী ত ঠিক হি বলেছে। হামারা গৌ-মাতার ইতনা সেবা করি- তা তুর বহুতো জগতমাতা আছে।' সকলের কাছে যে একদিন জগৎ মাতার সম্মান পেয়েছে চরম দুর্দশায় সে শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষেরও সম্মান পায় না। হালদার বাড়ির ছেলেরা বড় হয়ে গেলে সেখানে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তাই সেখান থেকে বলা হয়, 'হ্যাষ সন্তান দুধ ছারছে, তবুও আট বছর মা সিধা পাঠাইছে। উনি যা মন লয় তাই করছে। পোলারা কথা কয় নাই। কিন্তু অহন তো আর পারতাম না।' যশোদার রক্ত জল করা অন্নে কাঙ্গালি এতদিন প্রতিপালিত হয়েছে, যশোদার দুর্দিনে আজ সে কৃতিত্বের দাবিদার নিজেই। যশোদাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'কোত্থেকে ভাত জোগাড় করলি? হালদার বাড়ি তোর কপালে জুটত? আমার ঠ্যাং কাটা গেল বলেই না তোর কপালে ও বাড়ির দোর খুলল? কত্তা তো আমাকেই সব দেবেথোবে বলেছিল। সব ভুলে বসে আছিস মাগি?' যশোদার বুঝতে বাকি থাকে না সংসারে আর দেবার তার কিছু নেই তাই শুধু হালদার বাড়ি নয় কাঙ্গালির কাছেও তার দরকার ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু একসময় যশোদা যখন সমর্থ ছিল, তখন হালদার বাড়ির ঝি-রাও তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে। কারণ হালদার বাড়ির ছেলেদের মধ্যে যারা কিশোর তাদের বাপ-জ্যেঠা কাকারা গোঁফ গজাতেই ঝি-দের উপর আওয়াজ দিত। 'দুধ- মা'র দুধে তারাও মানুষ, তাই 'দুধ মা'র বন্ধু ঝি রাধুনীকে এখন তারা মাতৃভাবে দেখতে থাকলো এবং মেয়ে স্কুলের চারপাশে হাঁটাহাঁটি শুরু করল।' যশোদার মধ্য দিয়ে হালদার বাড়ির ছেলেদের হাত থেকে তারা নিস্তার পেল। যশোদার ক্ষমতা যখন অস্তমিত, তখন ঝি চাকররাও যশোদাকে সামান্যতম সহানুভূতি দেখায় না।

'স্তনদায়িনী' গল্পে যশোদার জীবন যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার পুঞ্জিভূত যন্ত্রণা লাঞ্ছনা ও প্রান্তিকায়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ধিক্কার প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানকে সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তথাকথিত শিক্ষিত উদার মানুষেরা মুখে নারী মুক্তির কথা বললেও নারীর মধ্যে মাতৃত্ব আরোপ করে তার নারীত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মানুষ মূল চিন্তা ভাবনা থেকে এখনো সরে আসতে পারে নি। গল্প শেষ হয়েছে এক তীব্র ব্যঙ্গ ও হতাশায়। গল্পে যশোদার জীবন দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন লেখিকা। নারীর প্রতি সমাজের অবহেলা ও বর্বরতা আজও যে বর্তমান, সেই অবস্থানের নিগড়টাকে চিনিয়ে দিয়েছেন যশোদা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তাঁর সৃষ্ট যশোদা হয়তো বা আরোপিত শৃঙখল ছিন্ন করতে পারেনি, কিন্তু শৃঙ্খলটার যথার্থ স্বরূপ তার জীবন দিয়ে চিনিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের মুক্ত মানবীর

পরিসরের সম্ভাবনাটুকুকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। বলাবাহুল্য সমাজের এক বৃহদাংশ নারী যে শুধু ভোগ্যপণ্য নয়, এই আজন্ম লালিত অভিশপ্ত বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি , তারই উত্তরাধিকার যেন যশোদা চরিত্র। অবস্থানকে নির্বিচারে মেনে নিলে নিজের অস্তিত্ব যে বিপন্ন হয়ে পড়ে তারই জলন্ত উদাহরণ যশোদা চরিত্র। এখানেই গল্পটির সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. গুপ্ত, অজয় সম্পাদনা। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র ৮। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৭৫।
২. দাস, সুনীল। পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট সচেতন হতে হয়, (সাক্ষাতকার ভিত্তিক রচনা) 'অমৃত লোক'-১০৩, মহাশ্বেতা সংখ্যা, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, সম্পাদনা সমীরণ মজুমদার, মেদিনীপুর, ২০০৫ পৃ. ১৩৮।
৩. রায়, অনিল কুমার। ছোটগল্প সমীক্ষা। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ৯ পৃ. ২৬৭।
৪. ভট্টাচার্য, শঙ্কর। 'ভূমিকা' মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র ৯। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গুপ্ত, অজয় সম্পাদনা। মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা ৭৩।
২. রায়, অলোক। বাংলা উপন্যাস, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা ৬।
৩. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার সম্পাদনা। গল্পচর্চা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯।
৪. পাল, রবিন। ছোটগল্পের বিন্দু বিশ্ব। পুস্তক বিপণি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯।
৫. চক্রবর্তী, রামী। মহাশ্বেতা নারী পরিসর ও অন্যান্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯।